□

২৪.০ উদ্দেশ্য

২৪.১ প্রস্তাবনা

২৪.২ ধর্মের ধারণা

২৪.২.১ ধর্মের স¥¤ন্ধে কিছু বক্তব্য

২৪.৩ ধর্ম ও সমাজ

২৪.৩.১ ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা

২৪.৩.২ ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা

২৪.৪ ধর্ম ও রাজনীতি

২৪.৪.১ ধর্মীয় রাজনীতি

২৪.৪.২ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি

২৪.৫ সারাংশ

২৪.৬ অনুশীলনী

২৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত সে স¥¤ন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এ প্রসঙ্গে আপনি জানতে পারবেন—

- ধর্মের ধারণা ও ধর্ম স¥¤ন্ধে কিছু বক্তব্য।
- ধর্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা।
- ধর্ম ও রাজনীতির স¥¤ন্ধ।
- ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি স¥¤ন্ধে ধারণা।

আগের এককে শিক্ষা ও রাজনীতির কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে আমরা ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে ধর্মের অর্থ, তারপর ধর্ম ও সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা এবং সবশেষে ধর্ম ও রাজনীতির স¥¤ন্ধ, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি স¥¤ন্ধে আলোচনা করা হল।

ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত, অতিমানবিক, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং এই শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা। ধর্ম শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কিছু অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, উৎসব ও ধর্মীয় বিষয়। ধর্মকে অনেকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, মানবতা বা নৈতিক শুদ্ধতা মনে করেন।

সমাজে ধর্মের নানা উপকারী ভূমিকা আছে, নানা অপকারী ভূমিকাও দেখা যায়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের ও সমাজের বাহ্যিক আচরণ ও মনের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে; দুঃখে বা বিপদে সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা দেয়; সাহিত্য, শিল্পকলা, ললিতকলার উন্নতি ঘটায়; বস্তুজগৎকেও প্রভাবিত করে এবং সমাজে ব্যক্তিদের সৌভ্রাত্র ও ঐক্যের বন্ধনে গ্রথিত করে। ধর্ম নানা সমাজসেবামূলক কাজেও প্রেরণা দেয়।

ধর্ম আবার মানুষের উদ্যম, প্রচেষ্টা ও স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে তাকে অদৃষ্ট নির্ভর করে তোলে; ধর্মান্ধতা ও বিজ্ঞান বিরোধিতার জন্ম দেয় এবং সমাজের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। মার্ক্স ধর্মকে উচ্চ শ্রেণী দ্বারা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীনকালে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে রাজার প্রতি জনগণের দ্বিধাহীন আনুগত্য সৃষ্টি করত। মধ্যযুগের ইউরোপে পোপ ও রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এই প্রশ্নে। ধর্ম নানা বিপ্লব ও আন্দোলনের সূচনা করেছে। আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতেও ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রার্থী বাছাই বা মন্ত্রীসভা গঠনে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীনকালে ধর্মীয় রাজনীতি প্রাধান্য পেত। আধুনিক কালে প্রায় সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ধর্মের ধারণাটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখা যাক। জেমস জি. ফ্রেজারের মতে, মানুষের থেকে উচ্চতর শক্তি, যা প্রকৃতির ধারা ও মানবজীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি সাধন হল ধর্ম। অগবার্ন ও নিমকফের আলোচনা অনুসারে ধর্ম হল মানুষের থেকে উচ্চতর শক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। ম্যাকাইভার মনে করেন যে, ধর্ম বলতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এবং মানুষ ও উচ্চতর কোনও শক্তির মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায়। এমিল ডুর্কহাইমের অভিমত অনুসারে ধর্ম হল এক ধরনের বিশ্বাস ও এক বিশেষ পদ্ধতি যার সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি পবিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে। এম. সি. ট্যাগার্টের মতে ধর্ম হল একটি আবেগ, যা মানুষ ও বিশ্বসংসারের মধ্যে ঐক্য আছে, এই প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার কোঁৎ মনে করেন যে, ধর্ম ও মানবতা অভিন্ন। তিনি মানবতাকেই ধর্ম হিসাবে গণ্য করেন। ধর্ম বলতে ম্যাকেঞ্জী পূর্ণ শুদ্ধতার প্রতি আন্তরিক অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণণও বলেছেন যে, সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের অনুসন্ধানই হল ঈশ্বরের আরাধনা।

ধর্ম স¥¤ন্ধে মার্ক্সের ধারণা পুরোপুরি বিপরীত। তিনি ধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম হল উৎপাদনের মালিক শ্রেণীর হাতে একটি বিশেষ হাতিয়ার, যার সাহায্যে সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীকে আফিমের নেশার ন্যায় মোহাচ্ছন্ন ও অবশ করে রাখা হয়। ধর্মীয় চেতনাকে তিনি মানুষের দাসভাবের পরিচায়ক মনে করেন। শ্রমজীবী জনগণ তাদের দুঃখকষ্টকে নিজেদের নিয়তি বা অদৃষ্ট মনে করে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। তাই ধর্ম থেকেই অদৃষ্টবাদ জন্ম নেয়।

অন্যদিকে আবার ম্যাক্স হ্বেবার ধর্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে স¥¤ন্ধ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

২৪.২.১ ধর্ম স¥¤

ধর্ম স¥¤ন্ধে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়।

(১) ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা বা দেবভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কোনও উচ্চতর শক্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সব ধর্মেই দেখা যায়। এই উচ্চতর শক্তিকে মহত্তম, সর্বগুণান্বিত ও শক্তিশালী মনে করা হয়।

(২) উচ্চতর শক্তির প্রতি বিশ্বাস থেকে মানুষের মনে নানা আবেগমূলক অনুভূতি, যেমন--ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। এগুলি ধর্মের অন্তর্গত।

(৩) ধর্মের একটি ক্রিয়ামূলক বা আনুষ্ঠানিক দিক আছে। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আবেগ বা অনুভূতি ব্যক্ত হয়। এইসব আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও ধর্মের অন্তর্গত।

(৪) পার্থিব বা অপার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিকে উচ্চতর শক্তির ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

(৫) ধর্ম একদিকে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানবজীবনে সর্বোচ্চ মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি আবার ধর্মের মধ্যে সামাজিক আদর্শ, সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক মূল্যবোধও দেখা যায়। তাই ধর্ম একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়।

(৬) সব ধর্মেরই একটা অন্তরঙ্গ এবং একটি বহিরঙ্গ দিক আছে। উচ্চতর শক্তির প্রতি আস্থা, অনুভূতি বা আবেগ হল ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক। আর ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ হল বহিরঙ্গ দিক। অন্তরঙ্গ দিকটি ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ আর বহিরঙ্গ দিকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) মার্ক্সবাদীদের কাছে ধর্ম কোনও উচ্চ ধারণা নয়, বরং মায়াজাল সৃষ্টি করে শ্রেণীশোষণকে অব্যাহত রাখার উপায়। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়।

১। ধর্ম স¥¤ন্ধে চারজন সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্য লিখুন।
(আপনার উত্তর ৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

ধর্ম একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আদিম সমাজে ধর্মবোধ ও ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল এবং আদিম কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সবদেশেই মানুষের মন ও সমাজে ধর্মের স্থায়ী আসন দেখা যায়। ধর্ম তাই একটি বিশ্বজনীন বিষয়। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের সামাজিক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং সমাজজীবনের অনেকাংশ জুড়ে ধর্মের অবস্থান। ধর্ম ব্যক্তি-মানুষকে নৈতিক পথে পরিচালিত করে এবং অনৈতিক পথ থেকে রক্ষা করে। উচ্চতর সত্তার প্রতি বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করে। এই ভাব তার বাহ্যিক আচার-আচরণ ও মানসিক চিন্তাভাবনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে। অতি-প্রাকৃতের সমর্থন দ্বারা ধর্ম সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকেও রক্ষা করে। ধর্ম কিছু সামাজিক কাজকে সমাজের বিরুদ্ধতা ও ঈশ্বর-বিরোধিতা বলে প্রচার করে। ধর্ম কিছু কাজকে আবার সমর্থনও করে। এইভাবে ধর্ম সামাজিক জীবনের একটি মডেল স¥প্রন্ধে ধারণা দেয়। সমাজে বিভিন্ন ঘটনা, উৎসব বা অনুষ্ঠান কোনও-না-কোনও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উপনয়ন, দীক্ষা ইত্যাদি ঘটনা; হালখাতা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি উৎসব এবং শস্য বপন, ধান্যরোপণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার ও অনুশাসন দেখা যায়। তাই বলা যায় যে, ধর্ম ব্যক্তি-মানুষের আচার-ব্যবহার ও সমাজের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম ও সমাজের স¥প্রন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের এই নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা খুবই প্রাসঙ্গিক।

ধর্ম সমাজের ব্যক্তিদের বাহ্যিক আচরণ ও মনের চিন্তাভাবনাকে সংযত করে ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটায়। সুস্থ, সুন্দর সমাজজীবনের জন্য নীতিগত সততা খুবই প্রয়োজন। ধর্ম মানুষকে সততার শিক্ষা দেয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। অসৎ পথকে পাপ বলে চিহ্নিত করে অসৎ পথ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। ধর্মবোধের প্রভাব মানুষকে সহ্যশক্তি, সহানুভূতি ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজবদ্ধ মানুষ যাতে সামাজিক প্রথা ও নিয়ম ঠিকভাবে মেনে চলে এবং সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে ধর্ম সে ব্যাপারেও সহায়তা করে। তাই বলা যায় যে, ধর্ম নীতিবোধ ও সততার শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে সুনীতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে মাঝে মাঝে সমস্যা বা হতাশা দেখা দেয়। ব্যক্তি তার জীবনে দুঃখকষ্ট বা বিপদের স¥œখীন হলে হতাশাগ্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়ে। উচ্চতর দৈবশক্তির আশ্রয় তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে। দুঃখবিপদে সে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। সমাজজীবনেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি মাঝে মাঝে সমাজকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ধর্ম ও উচ্চতর সত্তার আশ্রয় সমাজজীবনে নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার করে, আশার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে ধর্ম নিরাপত্তা, সান্ত্বনা ও আশা যোগায় এবং হতাশা বা বিপদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

ধর্মবোধের প্রেরণায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে নির্মিত হয়েছে নানা মন্দির, মসজিদ গির্জা, ইত্যাদি। নানা ধরনের সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলাও সৃষ্ট হয়েছে। তাদের শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, মাধুর্য ও কারিগরী উৎকর্ষ এখনও বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের আবেদন

তাই সমাজে ভাস্কর্য, সৌধ, সঙ্গীত ও চিত্রকলার সমৃদ্ধিসাধন করেছে বলা যায়। অর্থাৎ, ধর্মের আবেদন মানুষের সৃষ্টিশীল প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ধর্মের প্রভাবে সমাজের সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেছে।

ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের বস্তুগত ব্যবহারিক জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। ম্যাক্স হ্বেবার মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ ও ধর্মের সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা মানুষের ও সমাজের বস্তুগত জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধধর্ম পার্থিব জীবনকে অর্থহীন মনে করে ও বৈরাগ্যের ও নির্বাণের কথা বলে। তাই বৌদ্ধধর্মে বস্তুগত জীবনের সমৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। হিন্দুধর্মেও বস্তুগত সম্পদকে গুরুত্বহীন ভাবা হয়। তাই হিন্দুধর্ম অনুসরণকারী কোনও ব্যক্তি বস্তুগত সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট নন। ইসলাম ধর্ম পুঁজির বিরোধিতা করে। তাই পুঁজিবাদ সেখানে বাধা পায়। কিন্তু প্রটেস্টান্ট ধর্ম পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিকশিত করার সহায়ক শিক্ষা দেয়। তাই ইংল্যান্ড, হল্যান্ড বা আমেরিকায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি ঘটেছে।

মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি ধর্মীয় সংগঠনগুলির সামাজিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠনগুলিতে উপাসনা, পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে বহু মানুষ একত্রিত হয়। বিভিন্ন মানুষের মেলামেশার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ঈশ্বরের পিতৃত্বের ছায়ায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতি সৃষ্টি ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা।

ধর্মবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র 'অহং'-কে পরিত্যাগ করে বৃহৎ 'অহং' বা সামাজিক সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়; সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ সমষ্টিগত স্বার্থের চিন্তা করতে শেখে। ধর্মের মাধ্যমে তাই সমাজজীবনে ঐক্য ও সংহতি সাধিত হয়। ঈদ, খ্রীষ্টমাস, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যোগদান করে, একইভাবে আনন্দ উপভোগ করে এবং একই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। তাই সংযোগকারী বা সংহতিসাধনকারী হিসাবে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব খুব বেশি।

যথার্থ ধর্মবোধ ব্যক্তিকে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন ধর্মের জনহিতকর বা সেবামূলক নানা কাজ দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা, বন্যা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ, যেমন যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি বিপদের সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন হতাশাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজ করে। তাছাড়াও ধর্মীয় সংগঠন পরিচালিত হাসপাতাল, বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদিও দুঃস্থ, দরিদ্র, আর্ত মানুষের সাহায্য করে থাকে। ধর্মের এই সেবামূলক কাজের সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এতক্ষণ আমরা ধর্মের সামাজিক গুরুত্বের ইতিবাচক দিক দেখলাম, কিন্তু ধর্মের সামাজিক ভূমিকার কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেয় এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে ব্যাহত করে। ধর্ম অন্ধবিশ্বাস, উচ্চতর শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং নিয়তির কথা বলে। ফলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

ধর্মীয় প্রভাবে ব্যক্তি তার দুঃখকষ্ট ও বিপদকে অদৃষ্টের বা ভাগ্যের ফল মনে করে এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করতে শেখে। তারা আশা করে যে, পরবর্তীকালে উচ্চতর সত্তার দয়ায় তাদের জীবনের অন্ধকার বিদূরিত

হবে। ফলে নানা সামাজিক অন্যায়কেও তারা নীরবে মেনে নেয়। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করার মনোবৃত্তি ধর্মের প্রভাবে গড়ে ওঠে। ফলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা জনগণ হারিয়ে ফেলে। ফলে মানুষ কর্মবিমুখ ও অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে।

ধর্মের অনেক সমালোচক মনে করেন যে, ধর্ম বিচার-বিবর্জিত এবং আবেগপ্রবণ চিন্তাধারার জন্ম দেয়। তাঁদের ধর্মান্ধতা, অন্ধ কুসংস্কার এবং জ্ঞানের অভাব ধর্মের অবদান। ধর্মবিশ্বাসীদের ধারণা এই যে, ধর্মের মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞান, সত্য ও দর্শন নিহিত। তাই ধর্মের বাইরে এগুলির সন্ধান অর্থহীন। এই ধরনের বিশ্বাস, তথ্য ও জ্ঞানের জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে ধ্বংস করে, সৃজনমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধিতা করে।

ধর্মবিশ্বাসী ভাবেন যে, ধর্মীয় অনুশাসন হল শাশ্বত ও চিরন্তন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা, নতুন ভাবনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধর্ম তার আচার-অনুষ্ঠান অপরিবর্তিতভাবে জনগণের উপর চাপিয়ে রাখে। ফলে ধর্ম প্রগতিশীল ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে এবং রক্ষণশীলতার আমদানি করে।

ধর্মের মধ্যে যেমন সংহতিমূলক চেতনা থাকে, তেমনি আবার বিভেদমূলক শক্তিও থাকে। একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর একাত্মতা ধর্মবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। তেমনি আবার ধর্মবোধ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করে। ইতিহাসে ধর্মের ভিত্তিতে বৈরিতার উদাহরণ অনেক। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি ধর্মের মানুষের মধ্যে বৈরিতা, দাঙ্গা ও সংঘর্ষের উদাহরণ আছে। এই ধরনের বৈরিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করে এবং সমাজে বিদ্বেষমূলক ও বিভেদমূলক মনোভাবের সূচনা করে।

মার্ক্সের মতে, ধর্ম সমাজে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ধর্ম নামক হাতিয়ারটি উচ্চশ্রেণী বা উৎপাদনের মালিকশ্রেণীর হাতে থাকে এবং এর সাহায্যে শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর শোষণ চালানো হয়। ধর্ম সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে আফিমের নেশার মতো। এই নেশায় তাদের বিভোর করে রাখায় তারা সমাজের উচ্চ শোষক শ্রেণীর শোষণ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। তাই মার্ক্স ধর্মকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

অনুশীলনী - ২

১। ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

ধর্ম ও রাজনীতি—একটি হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় এবং অন্যটি বাস্তব জীবনে পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। তা সত্ত্বেও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ একে অন্যকে প্রভাবিত করে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃত্ব অনেক সময় ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং বৈধতা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ মতটি উল্লেখযোগ্য। এই মতানুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রের বৈধ শাসক। তাঁর মাধ্যমেই তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। রাজার আদেশ তাই ঈশ্বরের আদেশ। জনগণের কর্তব্য হল বিনা প্রতিবাদে তা মেনে চলা। রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করা। তাই রাজদ্রোহিতা হল ধর্মদ্রোহিতা। প্রাচীন ভারত, জাপান, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রচলন ছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র বলা হয়। রামায়ণের রামচন্দ্র হলেন বিষ্ণু। হিব্রু ধারণা ও ওল্ড টেস্টামেন্টেও রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাবা হত।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে ধর্মগুরু পোপ এবং রাষ্ট্রের শাসক রাজার মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলেছে। পোপ না রাজা—কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এই ছিল বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। উভয়েই জনগণের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে জনগণের আনুগত্য দাবি করেন।

একই সমাজে দু'টি কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। প্রথম দিকে চার্চের পোপ প্রাধান্য বিস্তার করেন। অনেক সময় রাজসিংহাসনের জন্য অনেক উত্তরাধিকারী দেখা যেত। কখনও বা কোনও উত্তরাধিকারী মিলত না। ফলে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার চার্চ গ্রহণ করত। অনেক সময় চার্চ রাজার শাসনকে বৈধতা প্রদান করত বা নতুন বিজিত ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রসারে সাহায্য করত। মধ্যযুগের শেষে অবশ্য ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজাই স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন স্বীকার করে যে, জাতীয় রাষ্ট্রের রাজারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতালাভ করেছেন। তবে সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ এবং চার্চের ধর্মজগৎ ছাড়াও পার্থিব জগতে প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাজাও অনেক সময় চার্চের সমর্থন খুঁজতেন।

ধর্ম অনেক সময় বিপ্লব, বিদ্রোহ বা আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। উদাহরণ হল প্রটেস্টান্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনে ধর্মীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সমন্বয় দেখা যায়। এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ হল ক্যাথলিক চার্চের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের জন্য রাজাদের ইচ্ছা।

ধর্ম ও রাজনীতির যোগ প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয়রা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতেন, অর্থাৎ রাজপদ লাভ করতেন। আবার হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়দের ওপর ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। অর্থাৎ, রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর ছিল ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা। আবার ধর্মীয় অনুশাসনে রাজার দায়িত্ব বা কর্তব্যেরও উল্লেখ থাকত। প্রাচীন চীনদেশের ধর্মীয় বিধান অনুসারে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল চীন সম্রাটের ওপর। তিনি তাঁর দায়িত্বপালনে অসমর্থ হলে মনে করা হত যে, তিনি শাসনের জন্য ঈশ্বরের অনুমোদন হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং, প্রাচীনকালে রাজার শাসনের কর্তৃত্ব ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা স্বীকৃত হত। আবার প্রজাদের অধিকারের প্রসঙ্গও সেখানে থাকত।

ধর্মানুরাগী ব্যক্তির রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। দেশের বিপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরাও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। রাজনীতির লোকেরাও ধর্মানুরাগীদের জীবনধারার

মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে অনুপ্রবিষ্ট করান। ফলে, আধ্যাত্মিক জগতের ধার্মিক মানুষেও রাজনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধর্মের জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না।

আধুনিক যুগে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার প্রভাব দেখা যায়। নির্বাচনী সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করে। কোনও কোনও নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী বাছাই প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে দলীয় প্রতীক প্রদান করে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার পর মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সরকার ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের এবং বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে না। রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরু বা আচার্য বা মৌলানাদের আশীর্বাদ ও সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়। ধর্মীয় নেতারাও এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এইভাবে ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধর্মীয় নেতারাও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন এবং ধর্মীয় অনুগামীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ভোট দেওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করেন।

ধর্মীয় বিষয় বা পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত ও রাষ্ট্রকেই ধর্মীয় রাষ্ট্র বলা হয়। এই ধর্মীয় রাষ্ট্রে ঐশ্বরিক আইন প্রচলিত থাকে, চার্চ বা যাজক সম্প্রদায় বা পুরোহিতদের প্রাধান্য থাকে এবং শাসনের বৈধতা আসে ঐশ্বরিক উৎস থেকে। মধ্যযুগে মুসলমানদের আমলে ভারতের শাসন ধর্মীয় রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত ছিল। সুলতানদের শাসনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলিকে কার্যকর করা। সুলতানরা প্রশাসনিক ও ধর্মীয় উভয় দিকেই চূড়ান্ত ক্ষমতাভোগ করতেন। সুলতানি আমলে শরিয়তের নির্দেশনামাই ছিল রাজকীয় অনুশাসনের ভিত্তি। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সামাজিক নিয়ম প্রণীত হত।

ইসলামীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি, শক্তি ও সংগঠন হিসাবে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে পয়গ¥¤রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর খলিফার কর্তৃত্ব দেখা যায়। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রাধান্য ছিল। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদই উলেমা নামে পরিচিত ছিলেন। উলেমারা শরিয়ৎ ব্যাখ্যা করতেন। সুলতানরা সেই ব্যাখ্যা মেনে তদনুসারে শাসন করতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপেও চার্চের প্রাধান্য ছিল। পোপ গেলাসিয়াস--১ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯২-৯৬) মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চ ও রাজার দ্বৈত কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে, উভয়ের মধ্যে চার্চের দায়িত্বই অধিকতর। রাজার কর্তব্য ছিল ঐশ্বরিক মতে চলা; কিন্তু পোপ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। রাজার দায়িত্ব ছিল পোপের মতে চলা। এক শতক আগে সেন্ট অ্যামব্রোস বলেছিলেন যে, রাজা চার্চের অন্তর্গত, চার্চের ওপর নয়। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে পোপের প্রাধান্য প্রচার করা হয়। রাজার ভূমিকা ছিল কর্তব্যপালন; রাজা তাঁর কর্তব্য ঠিকমত পালন করলে চার্চ ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ দ্বারা রাজার শাসনকে যাথার্থ প্রদান করত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মার্সিগ্লিও, ম্যাকিয়াভেলি বা বোডিনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চার্চের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য রাজনীতির জগতেও প্রসারিত ছিল।

বর্তমান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। এখানে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর কোরান ও শরিয়তের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যেও কিছু ইসলামীয় রাষ্ট্র আছে। সেখানেও শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে শাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, নেপাল হল হিন্দুরাষ্ট্র। তবে আধুনিক কালে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত।

মানব সভ্যতার প্রথম যুগে ধর্মই ছিল সমাজ ও রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রণ। প্রাকৃতিক কার্যকারণ সূত্র, প্রকৃতির নিয়ম স¥ন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি পরবর্তীকালে প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বদলে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রাধান্য দেখা যায়। ধর্মের দৃষ্টির বদলে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মীয় রাজনীতির বদলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

পশ্চিমী জগতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক থেকে রাজনীতি ও পার্থিব বিষয় থেকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে পৃথক করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে, ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী বা দেবতাহীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় বিবেচনার অবলুপ্তি, সব ধর্মের লোকেদের সমান সুযোগ, মনুষ্যসৃষ্ট আইনের প্রাধান্য, জনগণের নির্দেশ দ্বারা রাজনৈতিক বৈধতাকরণ এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনাকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা হয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুরুত্ব লাভ করে এবং যুক্তির মানদণ্ডে সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বর্তমানের বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও পশ্চিমীকরণের প্রভাব এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বিকাশে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুকূলে নানা সাংবিধানিক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।

এসত্ত্বেও বলা যাবে না ধর্ম ও রাজনীতির কোনও সংযোগ বর্তমানে নেই। ধর্মীয়, রাজকীয় বা পুরোহিততন্ত্র এখন আর নেই। কিন্তু রাজনীতি ও ধর্মের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয় নি। সংগঠিত খ্রীষ্টান ধর্মাবল¥ীরা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। ইহুদি ধর্ম, ইসলাম মৌলবাদ, চরমপন্থী ক্যাথলিক মতবাদ এখনও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে শিখ ধর্মাবল¥ীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী - ৩

১। ধর্ম ও রাজনীতির সম্বন্ধ আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মীয় রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

৩। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

আলোচ্য এককে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে ধর্মের ধারণা, তারপর ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক, ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা এবং সবশেষে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম এক উচ্চতর সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে। ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সেই উচ্চতর সত্তার আশীর্বাদ লাভ করতে চায়। ধর্মের মধ্যে একদিকে বিশ্বাস ও আবেগ অন্যদিকে কিছু কর্মপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান আছে। প্রথমটি ধর্মের ভিতরের এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের বাইরের দিক। অনেকে আবার মানবতা, শুদ্ধতা ও সত্যকেই ধর্ম মনে করেন। মার্ক্সবাদীরা ধর্মকে সমালোচনার চোখে দেখেন এবং ধর্মকে শ্রেণীশোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম সমাজে নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের বাহ্যিক আচরণ ও মানসিক ভাবনাচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিপদের সময় ধর্মের আশ্রয় ব্যক্তিকে, সমাজকে নিরাপত্তা প্রদান করে। ধর্মীয় প্রেরণায় নানা উন্নত সাহিত্য, চিত্রকলা, সৌধ, সঙ্গীত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে এবং সংস্কৃতির উন্নতি ঘটেছে। বস্তুজগতের অর্থনৈতিক আচরণেও ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাবেশ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে। ধর্মের সমাজসেবামূলক কাজও কম নয়।

ধর্ম আবার ব্যক্তিকে উচ্চতর সত্তার প্রতি নির্ভরশীল করে তার স্বাধীন বিকাশকে বাধা দেয় ও তাকে ভাগ্যনির্ভর করে তোলে। ধর্ম অনেক সময় কুসংস্কারের জন্ম দেয় ও বিজ্ঞানবিমুখতা সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। ধর্মীয় আবেগ অনেক সময় বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক প্রবণতা নিয়ে আসে। মার্ক্স তো ধর্মকে শ্রেণীশোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম আবার রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং রাজনীতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ ধর্মের সাহায্যে রাজার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। মধ্যযুগে পোপ ও রাজার মধ্যে বিরোধ ঘটেছে এবং উভয়েই নিজ প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করেছে। ধর্ম অনেক সময় বিপ্লব বা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বলাভ করেছে।

মধ্যযুগে ইউরোপে ও ভারতে ধর্মীয় রাজনীতি প্রচলিত ছিল। এখন নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রাধান্যলাভ করেছে। ভারতের সংবিধান ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা ঘটিয়েছে। তবে এখনও মাঝে মাঝে রাজনীতি ও ধর্মের সংযোগ নানা মৌলবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা নির্বাচনী রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য।

১। ধর্ম বলতে কী বোঝায়?
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা কী?
(২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

৩। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।
(৩০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

৪। ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি কাকে বলে?
(২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

১) Rakhahari Chatterjee (ed.) : Religion, Politics and Communication, The South Asian experience, South Asian Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 110002, 1994, pp. 1-20.

২) Bottomore : Sociology, Blackie & Son (India Ltd.), Bombay, 1979 (4th Impression), pp. 237-249.

৩) Roumila Thapar : From Lineage to State, Oxford, New Delhi, 1990, pp. 62-7.

৪) অনাদি কুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম) ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪২১-৪৬১।

৫) Kingsley Davis : Human Society, Surjeet Publication, Delhi, 1981, pp. 509-545.

৬) টম বটোমার : সমাজবিদ্যা, অনুবাদক হিমাচল চক্রবর্তী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৬২।

৭) ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, সেন্ট্রাল বুক পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৩৮-২৫৮।